CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ | আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স | সেপ্টম্বর ২০০৫

ভেতরের পাতায় . . .

৬ ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে সংগৃহীত জনমিতি-সংক্রান্ত সূচকসমূহের নির্ভুলতা

১০ বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর স্বামীদের সাময়িকভাবে বাড়ি থেকে দুরে অবস্থান করার প্রভাব

১৬ সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

মতলবে হেপাটাইটিস ই ভাইরাসের (এইচইভি) রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ – প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত কিছু ফলাফল

হেপাটাইটিস ই ভাইরাস (এইচইভি)-এর সংক্রমণের ফলে মারাত্মক অসুস্থতা দেখা দেয় এবং অনেকের মৃত্যু হয় বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে। মতলবে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠির রক্তে বয়স-ভিত্তিক এইচইভি এবং অন্যান্য হেপাটাইটিস ভাইরাসের এন্টিবডির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে সংগৃহীত ১,১৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করে সেগুলোর মধ্যে ১৪৬টিতে (১২.৯%) এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিজি টাইটার দেখা যায়, যার মাত্রা ছিলো প্রতি মিলিলিটারে ৪০ ডব্লিউআরএআইআর ইউনিটেরও বেশি এবং যা নিশ্চিতভাবে অতীত সংক্রমণের ইঙ্গিতবাহী। মহিলাদের (১১.১%) রক্তে এন্টিবডির পরিমাণ পুরুষদের (১৫.০%) তুলনায় কম ছিলো। ১,০৮০ জনের রক্ত পরীক্ষা করে তাদের ৩৮০ জনের মধ্যে (৩৫.২%) এইচবিসি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস বি কোর), ৯১৭ জনের মধ্য থেকে ১৪ জনের মধ্যে (১.৫%) এইচসিভি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস সি), এবং ১২৪ জনের মধ্য থেকে ১১৬ জনের মধ্যে (৯৩.৫%) এইচএভি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস এ) এন্টিবডি পাওয়া গেছে। এ-ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, এইচইভিসহ অন্যান্য ভাইরাল হেপাটাইটিস বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিরাজমান, যার সমাধানকল্পে আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

হেপাটাইটিস ই ভাইরাস (এইচইভি)-এর সংক্রমণের ফলে পৃথিবীব্যাপী এ-রোগ বিক্ষিপ্তভাবে এবং মহামারী আকারে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা তৈরি করে এবং একমাত্র অন্ত্রের মাধ্যমে সংক্রামিত নন-এ এবং নন-বি হেপাটাইটিস রোগ হিসেবে স্বীকৃত (১)। অনেক উন্নয়নশীল দেশে ভাইরাসটিকে এনডেমিক হিসেবে মনে করা হয়, যদিও দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বড় ধরনের একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিরাজমান। বেশিরভাগ সংক্রামিত রোগীর ক্ষেত্রেই এইচইভি সংক্রমণের লক্ষণ বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের ২০-৩০%-এর মধ্যে জন্ডিসসহ তীব্র (অ্যাকিউট) ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগের লক্ষণ দেখা যায়। রোগটি স্বনিয়ন্ত্রিত এবং এ-রোগের ফলে রোগীর শরীরের কোনো পরিবর্তন বা ক্ষতি (সেকুলাই) পরিলক্ষিত হয় নি অথবা রোগীকে এ-রোগের বাহক হিসেবে বোঝা যায় নি (২,৩)। সাধারণ জনগোষ্ঠিতে এইচইভি-তে আক্রান্ত রোগীর

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

মধ্যে মৃত্যুহার কম (~১%), কিন্তু এ-রোগে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিক-এ (ট্রাইমিস্টার) মৃত্যুহার >২০% (৪,৫)। বর্ধিত এ-মৃত্যুহার, যার কারণ খুব কমই বোধগম্য, এখনো এইচইভি-এর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়ে গেছে। গর্ভকালীন সময়ে মেমব্রেন রাপচার (পর্দা ছিড়ে যাওয়া), আপনা-আপনি গর্ভপাত এবং মৃত-সন্তান প্রসব করাও এইচইভি সংক্রমণের সাথে জড়িত। সংক্রামিত গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁদের সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ দেখা গেছে এবং এ-সময়ের মধ্যে শিশুমৃত্যু হার প্রায় ২৫% পর্যন্ত দেখা গেছে (৬-৮)।

এইচইভি রোগের লক্ষণ প্রকাশের সুপ্তিকাল (ইনকিউবেশন পিরিয়ড) গড়ে প্রায় ৪০ দিন। অসুস্থতা বোধ, জ্বর এবং ক্ষুধামন্দা থেকে যকৃতের বৃদ্ধি এবং ওভার্ট জন্ডিস-এর লক্ষণসহ অসুস্থতার মেয়াদকাল দুই এবং চার সপ্তাহের মধ্যে থাকতে পারে। দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রক্তের মধ্যে রোগের জীবাণু অবস্থান করে এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর তা আর দেখা যায় না। রোগ সংক্রমণের পরপরই রোগীর মধ্যে এইচইভি এন্টিবডি সনাক্ত করা যায় এবং রোগের লক্ষণ যখন দেখা যায় ঠিক সেই সময়ে এইচইভি এন্টিবডির টাইটার পরিলক্ষিত হয়। সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পর এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিএম টাইটার খুব দ্রুত কমে যায় এবং এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিজি-এর বৃদ্ধি কয়েক মাস যাবত অব্যাহত থাকে। অনেকগুলো গবেষণায় দেখা গেছে যে, সংক্রমণের কয়েক বছর পর আইজিজি-র বিস্তারও নাটকীয়ভাবে কমে যায়– কখনো কখনো এমন পর্যায়ে নেমে যায় যে, তা নির্ধারণ করা যায় না (৯,১০)। এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিজি ভবিষ্যতে পুনরায় সংক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কাজ করে কি না তা পরিষ্কার নয় (১,১১)। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মলের মধ্যে এইচইভি ভাইরাস পরিলক্ষিত হয় এবং সুস্থ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়েও তা বিদ্যমান থাকে (১১)। এ-থেকে বোঝা যায় যে, এ-ভাবেই প্রাদুর্ভাবের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রোগটি ছড়ায়।

গুরুতর অসুস্থ এইচইভি রোগীর ক্ষেত্রে বর্তমান চিকিৎসা হচ্ছে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা প্রদান করা। হেপাটাইটিস এ ভাইরাস প্রতিরোধের সুপারিশ অনুযায়ী এইচইভি-এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভ্রমণকারীদেরকে এনডেমিক এলাকায় গিয়ে নিরাপদ নয় এমন পানি পান থেকে এবং রান্নাবিহীন ফলমূল, শাকশব্জি এবং চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ও খোলসওয়ালা মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে (১২)। পশুর মধ্যে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় প্রকার ইম্মিউনোপ্রোফাইল্যাক্সিস কার্যকরভাবে দেখা গেছে (১৩)। মানুষের ব্যবহার উপযোগী বেশ কিছু ভ্যাকসিন তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলোর কিছু কিছু ইতোমধ্যে তৈরিও হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সেগুলোর প্রয়োগের পরীক্ষাও বর্তমানে চলছে (১,১৩)। এর ফলে এইচইভি সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রোফাইল্যাক্সিস আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে।

ক্লিনিক-নির্ভর কিছু রোগী ছাড়া বাংলাদেশে হেপাটাইটিস ই রোগ-সম্পর্কিত সমস্যার কথা খুব কমই জানা যায়। শহর বা গ্রামাঞ্চলের কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যেই জনসংখ্যা-ভিত্তিক কোনো গবেষণা এখনো পরিচালিত হয় নি। বাংলাদেশে এ-রোগটি যে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করছে তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে, যদিও এর প্রাদুর্ভাবের কথা এখনো কোনো সাময়িকিতে প্রকাশিত হয় নি। তবে এ-সম্পর্কিত ক্লিনিক্যাল এবং পরীক্ষামূলক প্রমাণ রয়েছে যা ঢাকার বিভিন্ন রেফারেন্স ল্যাবরেটরি থেকে জানা গেছে এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (অপ্রকাশিত)।

মতলবে এইচইভি গবেষণার একটি উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি এলাকায় বিভিন্ন বয়সের মানুষের রক্তে এইচইভি এন্টিবডির প্রকোপ নির্ধারণ করা। গবেষণাটির পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানকার বিভিন্ন বয়সের জনগণের কাছ থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোতে এইচইভি-রোগের লক্ষণ বা এ-রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয় মতলবে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র মা ও শিশুস্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা-সম্পর্কিত একটি কোহর্ট প্রকল্প থেকে। মতলব হেলথ্ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভিলেন্স সিস্টেমের আওতায় ৬৭টি গ্রামের ১১০,০০০ লোকের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করা হয় (১৪)। নির্বাচিত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাদের নিজ নিজ বাড়িতে বসে সাক্ষাৎকার (এক থেকে ১৮ বছর-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের) নেওয়া হয়, এবং এ সাক্ষাৎকার নেন প্রশিক্ষিত মাঠকর্মীরা। আঙ্গুলের মাথা থেকে একটু রক্তের নমুনা দিতে ইচ্ছুক কি না তা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাদের সাক্ষাৎকারের সময় জেনে নেওয়া হয়। বেজলাইন সমীক্ষার ১২ এবং ১৮ মাস পর পুনরায় অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আলোচ্য প্রতিবেদনে শুধুমাত্র বেজলাইন সমীক্ষার ফলাফল সন্নিবেশিত হয়েছে।

এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিজি নির্ধারণী অ্যাসে পরিচালিত হয় থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অবস্থিত আর্মড ফোর্সেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স (এএফআরআইএমএস)-এর ভাইরোলোজি ল্যাবরেটরিতে। এইচইভি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এএফআরআইএমএস হচ্ছে বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে স্বীকৃত একটি সংস্থা এবং হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি। বাজারে যদিও এন্টিবডি অ্যাসে পাওয়া যায়, তবে এপিডেমিওলোজিক্যাল গবেষণায় ব্যবহারের জন্য এসব ক্লিনিক্যাল অ্যাসের উপযুক্ততা প্রশ্নের সম্মুখীন। এইচইভি জীবাণুর এসএআর-৫৫ প্রজাতির ওপেন রিডিং ফ্রেম ২ (ওআরএফ ২)-এর ভিত্তিতে এএফআরআইএমএস এলিসা একটি রিকম্বিনেন্ট এইচইভি এন্টিজেন ব্যবহার করে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে (১৬) যখন অ্যাসেটি করা হয়, যার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে (১৫), তা ৯৬% সুক্ষ্ম অনুভবশীলতা এবং ৯৮% সুনির্দিষ্টতা অর্জণ করতে সক্ষম হয়।

বেজলাইন জনগোষ্ঠী থেকে বৈদচয়নের ভিত্তিতে সংগৃহীত ১,১৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করে সেগুলোর মধ্যে ১৪৬টিতে (১২.৯%) এইচইভি-প্রতিরোধী আইজিজি-এর টাইটার দেখা যায়, যার সর্বোচ্চ মাত্রা ছিলো প্রতি মিলিলিটারে ৪০ ডব্লিউআরএআইআর ইউনিটেরও বেশি এবং যা নিশ্চিতভাবে অতীত সংক্রমণের ইঙ্গিতবাহী। হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে সংগৃহীত রক্তের নমুনাসমূহের এইচইভি-প্রতিরোধী পরীক্ষার পর যে সীমিত পরিমাণ সিরাম অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে প্রথমে এইচবিসি-প্রতিরোধী পরীক্ষা, তারপর এইচসিভি-প্রতিরোধী পরীক্ষা এবং পরিশেষে এইচএভি-প্রতিরোধী পরীক্ষা করা হয়। ১,০৮০ জনের রক্ত পরীক্ষা করে তাদের মধ্য থেকে ৩৮০ জনের মধ্যে (৩৫.২%) এইচবিসি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস বি কোর), ৯১৭ জনের মধ্য থেকে ১৪ জনের মধ্যে (১.৫%) এইচসিভি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস সি), এবং ১২৪ জনের মধ্য থেকে ১১৬ জনের মধ্যে (৯৩.৫%) এইচএভি-প্রতিরোধী (হেপাটাইটিস এ) এন্টিবডি পাওয়া গেছে। সবগুলো নন-এইচইভি পরীক্ষা করা হয় 'অ্যাবোট মরেক্স ইআইএ' পদ্ধতিতে (সারণি ১)।

সারণি ১: মতলবে ভাইরাল হেপাটাইটিস সংক্রমণের সেরোপ্রিভ্যালেন্স (২০০৪-২০০৫)

জীবাণু	ইআইএ অ্যাসে	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	পজিটিভ	% প্রিভ্যালেন্স
এইচইভি (আইজি)	ডব্লিউআরএআইআর	১,১৩৪	১৪৬	১২.৯
এইচসিভি-প্রতিরোধী (আইজিজি)	মরেক্স	৯১৭	১৪	১.৫
এইচবিসি-প্রতিরোধী (মোট)	মরেক্স	১,০৮০	৩৮০	৩৫.২
এইচএবি-প্রতিরোধী (মোট)	মরেক্স	১২৪	১১৬	৯৩.৫

চিত্র ১-এ দেখা যাচ্ছে যে, বয়স-অনুযায়ী সেরোপ্রিভ্যালেন্সের হার জীবনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে পদার্পণকারী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। এর মধ্যে ৩১-৩৫ বছর-বয়সীদের মধ্যে সেরোপ্রিভ্যালেন্সের হার দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি (২৪.০%)। এটি একটি অসাধারণ এপিডেমিওলোজিক ঘটনা যে, রোগটি অন্ত্রের মাধ্যমে সংক্রামিত বলে মনে করা হয় এবং ইতোপূর্বে নেপাল, ভারত এবং মিশরে পরিচালিত একই ধরনের গবেষণায় তা পরিলক্ষিত হয়েছে (১)। একাশি থেকে ৮৫ বছর বয়স শ্রেণীতে সেরোপ্রিভ্যালেন্সের সর্বোচ্চ মাত্রা (৩৩.০%) দেখে মনে হয় যে, এটি এ-বয়সের মানুষের জন্য অল্পসংখ্যক নমুনারই (সংখ্যা=৬) প্রতিফলন। এ-নমুনায় পুরুষদের থেকে (১৫%) মহিলাদের মধ্যে (১১.১%) সেরোপ্রিভ্যালেন্সের হার কম দেখা গেছে এবং বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীতে এ-বৈশিষ্ট্য একই রকম পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র ১: বয়স-ভিত্তিক এইচইভি-প্রতিরোধী এন্টিবডির সেরোপ্রিভ্যালেন্স
(এইচইভি-প্রতিরোধী আইজি ≥৪০ ইউনিট/মিলিলিটার, সংখ্যা=১৪৬)

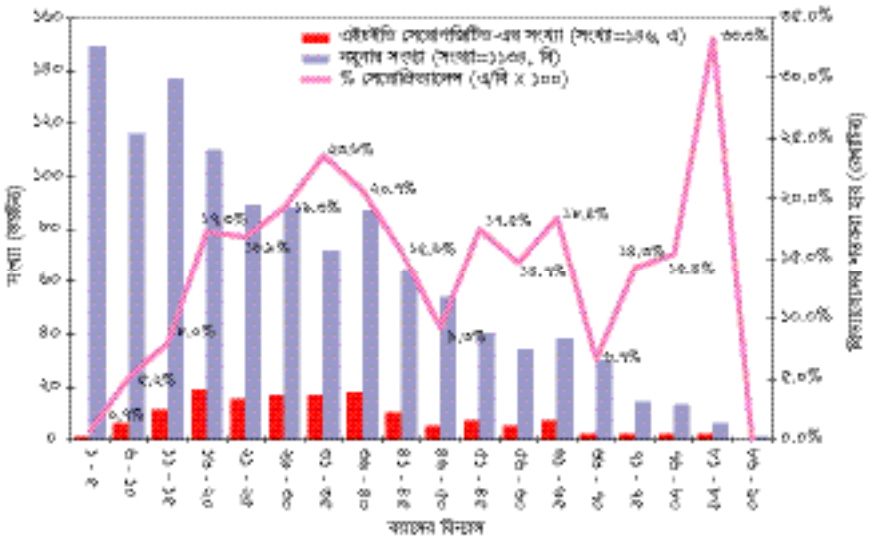

প্রতিবেদক: পাবলিক হেলথ্ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ এবং ডিপার্টমেন্ট অব এপিডেমিওলোজি, ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ্, জনস্ হপকিন্স ইউনিভার্সিটি

অর্থানুকুল্য: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ্, ইউএসএ

মন্তব্য

প্রতিনিধিত্বমূলক এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে সংগৃহীত নমুনা থেকে প্রাপ্ত এ-উপাত্তসমূহই বাংলাদেশে এইচইভি এবং অন্যান্য ভাইরাল হেপাটাইটিস-এর ওপর গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি-নির্ভর সেরোপ্রিভ্যালেন্স সমীক্ষার প্রথম প্রকাশিত প্রতিবেদন। আলোচ্য উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি গ্রাম এলাকায় হেপাটাইটিস রোগ-সম্পর্কিত বড় ধরনের সমস্যা বিরাজমান যা এর আগে কখনো প্রকাশিত হয় নি। বিশেষ করে, এইচইভি বাংলাদেশে জাতীয় গুরুত্ববহ একটি অস্বীকৃত সমস্যা হিসেবে বিরাজমান। এর ফলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে রোগাক্রান্ত হওয়ার (মরবিডিটি) সম্ভাবনা এবং মা ও চার সপ্তাহ-বয়সী শিশুমৃত্যুর উচ্চ হারও দেখা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সংঘটিত এইচইভি রোগের ওপর এপিডেমিওলোজিক্যাল তথ্য এবং এ-সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়গুলো খুব কম আলোচিত হয়েছে। তবে এ-রোগের তথ্য-সংক্রান্ত এসব শূন্যতা পূরণের জন্য বর্তমানে মতলবে এর ওপর গবেষণা চলছে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে সংগৃহীত জনমিতি-সংক্রান্ত সূচকসমূহের নির্ভুলতা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠকর্মীগণ প্রতি বছর 'ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ' (জিআর) নামে পরিচিত একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবগুলো বাড়ি (খানা) পরিদর্শনের চেষ্টা করেন। আমরা জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জাতীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রাক্কলিত স্থূল জন্মহার, শিশু মৃত্যুহার এবং স্থূল মৃত্যুহার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' (এসভিআরএস) এবং 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও জনমিতি জরিপ' (বিডিএইচএস) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তুলনা করেছি। জিআর-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাক্কলিত স্থূল জন্মহার অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হারের সাথে যথেষ্ট সমঞ্জস্যপূর্ণ হলেও শিশু মৃত্যুহার অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হার থেকে ৭৫% এবং স্থূল মৃত্যুহার ৪০% কম। জিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এ-ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিশ্রুত উল্লেখযোগ্য সম্পদের বরাদ্দ যেখানে রয়েছে, সেখানে কার্যক্রমটি আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠকর্মীগণ প্রায় চার যুগ ধরে 'ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ' (জিআর) নামক একটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের জনসংখ্যাভিত্তিক ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। বর্তমানে জিআর-এর মাধ্যমে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলো হলো– ৬৪টি সূচকসম্পর্কিত তথ্য এবং বাছাইকৃত ১৪টি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব-সংক্রান্ত তথ্য (১)। এসব তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য চার থেকে ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে এ-সময়ে মাঠকর্মীদের অন্যান্য অবশ্য-পালনীয় দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি হয়। জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত সূচকসমূহের নির্ভুলতা কখনো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখা হয় নি।

আমরা জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জাতীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রাক্কলিত স্থূল জন্মহার, শিশু মৃত্যুহার এবং স্থূল মৃত্যুহার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর এসভিআরএস (২) এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও জনমিতি জরিপ (বিডিএইচএস) থেকে প্রাপ্ত (৩) ফলাফলের সাথে তুলনা করেছি। বিবিএস-এর জরিপের জন্য জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ৫০০টি প্রাথমিক নমুনা ইউনিটের নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিট ২৫০টি বাড়ি নিয়ে গঠিত এবং যখনই কোনো জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ-সংক্রান্ত ঘটনা ঘটে একজন স্থানীয় নিবন্ধনকারী তা নিবন্ধন করেন (২)। বিডিএইচএস-এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল গুচ্ছ নমুনা-সম্বলিত বাড়িগুলো থেকে বিগত পাঁচ বছরের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ-সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

জিআর-এর মাধ্যমে নমুনা নয় বরং প্রতি বছর সকল বাড়ির সদস্যদের গণনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনের জন্য জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ দু'টি ভিন্ন পন্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, পাঁচ বছর মেয়াদি (১৯৯৮-২০০৩) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় প্রণীত নতুন তথ্য পদ্ধতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইউনিট এবং আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে পরীবিক্ষণের জন্য ২০০০ সালে ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে দু'টি করে উপজেলা নির্বাচন করে (৪)। নির্বাচিত উপজেলাসমূহের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী অবকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত জিআর-এর মাধ্যমে নির্বাচিত উপজেলাসমূহের জন্য সংকলিত তথ্য থেকে বিভাগীয় ও জাতীয় হারসমূহ নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, একীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইউনিটের প্রতিবেদনে জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত সবগুলো উপজেলার উপাত্ত থেকে ২০০২ সালের জন্য বিভাগওয়ারী এবং জাতীয় স্থূল জন্মহার দেখানো হয়েছে (৫)।

বিভাগওয়ারী স্থূল জন্মহার এবং এ-হার প্রাক্কলনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে তারতম্য দেখা গেছে (সারণি ১)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এসভিআরএস-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তে বিভিন্ন বিভাগের এক বছর থেকে অন্য বছরের স্থূল জন্মহারে যে তারতম্য দেখা যায় তা প্রত্যেক বিভাগের দু'টি করে উপজেলা থেকে জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রাক্কলিত হারের তারতম্য থেকে কম। প্রতিটি বিভাগ থেকে নেওয়া দু'টি করে উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর প্রাক্কলিত স্থূল জন্মহার এবং গ্রামাঞ্চলের সব উপজেলার স্থূল জন্মহার ছিলো একইরকম। জিআর তথ্য অনুযায়ী খুলনা বিভাগে তিন বছরই স্থূল জন্মহার ছিলো সবচেয়ে কম, তবে এসভিআরএস-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তে এ-হার বরিশাল বিভাগে ছিলো সবচেয়ে কম। ২০০০ এবং ২০০২ সালের জিআর অনুযায়ী সিলেট বিভাগে স্থূল জন্মহার ছিলো সবচেয়ে বেশি, তবে এসভিআরএস তথ্য অনুযায়ী স্থূল জন্মহার ২০০০ সালে সবচেয়ে বেশি ছিলো রাজশাহী বিভাগে এবং ২০০২ সালে ঢাকা বিভাগে।

*সারণি ১: বিভাগওয়ারী স্থূল জন্মহার**

বিভাগ	ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ				স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম		
	প্রতিটি বিভাগের দু'টি উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত			বিভাগের সব গ্রামীণ উপজেলা			
	২০০০	২০০১	২০০২	২০০২	২০০০	২০০১	২০০২
বরিশাল	২১.৪	২২.৮	২১.৬	২৫.০	১৯.২	১৯.৪	১৯.০
চট্টগ্রাম	২৫.৫	২৭.৭	২২.৪	২৬.৩	২১.৩	২১.২	২১.৫
ঢাকা	২৫.৭	২৬.০	২৪.৭	২৬.০	২০.৭	২১.১	২২.৬
খুলনা	১৯.৫	১৯.৯	২০.৩	২২.১	২১.০	২০.০	২০.৭
রাজশাহী	২৬.৩	২৫.১	২৭.১	২৪.৫	২১.৪	২১.২	২০.৬
সিলেট	২৬.৪	২০.৫	২৭.৮	২৮.৭	২১.০	২০.৬	১৯.৭
সকল বিভাগ	২৪.৫	২৪.০	২৪.১	২৫.৪	২০.৮	২০.৭	২১.০

*প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যায়

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণীত শিশু মৃত্যুহার-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য বিদ্যমান। জিআর তথ্যে শিশু মৃত্যুহার সবচেয়ে কম, তবে এসভিআরএস-এ এ-হার তার থেকে আনুমানিক চার গুণ বেশি, আবার বিডিএইচএস-এ আরো বেশি, যে প্রতিবেদন থেকে গত পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর গড় হিসাব পাওয়া যায় (সারণি ২)।

এসভিআরএস-এ প্রাপ্ত স্থূল মৃত্যুহার জিআর থেকে প্রাপ্ত হারের চেয়ে সবসময়ই ৪০% বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে (সারণি ৩)।

উপজেলা পর্যায়ের জনমিতি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের বিস্তারিত তথ্য অভয়নগর এবং মীরসরাই উপজেলাস্থ নির্দিষ্ট ইউনিয়নসমূহে আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক পরিচালিত ডেমোগ্রাফিক সার্ভিলেন্স থেকে পাওয়া যায়। ১৯৮২ সাল থেকে অভয়নগর উপজেলার মোট আটটি ইউনিয়নের মধ্যে পাঁচটিতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ছয়ভাগের একভাগ বাড়িতে এবং ১৯৯৫ সাল থেকে মীরসরাই

উপজেলার মোট ১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে সাতটিতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে এক-চতুর্থাংশ বাড়িতে এই সার্ভিলেন্স কার্যক্রম চলে আসছে (৬)। এ-দু'টি উপজেলার ওপর জিআর-এর মাধ্যমে পরিচালিত চার বছরের প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে। ওইসব ইউনিয়ন থেকে জিআর-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের সাথে আমরা আইসিডিডিআর,বি-র সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সরাসারি তুলনা করেছি।

*সারণি ২:বিভাগওয়ারী শিশু মৃত্যুহার**

বিভাগ	ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ			স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম			বিডিএইচএস
	২০০০	২০০১	২০০২	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৪
বরিশাল	১০	১১	৭	৫৭	৫৪	৬৩	৬১
চট্টগ্রাম	১৩	৩	২০	৬৩	৬৩	৫৬	৬৮
ঢাকা	৮	৭	১২	৬২	৬২	৪৮	৭৫
খুলনা	৩৩	২৭	২২	৫৮	৫২	৪৭	৬৬
রাজশাহী	১৫	১৯	২১	৬৩	৬৪	৬৭	৭০
সিলেট	১০	১৫	১৪	৬২	৬৪	৬৮	১০০
সকল বিভাগ	১৪	১৩	১৬	৬২	৬০	৫৭	৬৫

* প্রতি ১,০০০ জীবিত প্রসবে

*সারণি ৩: বিভাগওয়ারী স্থূল মৃত্যুহার**

বিভাগ	ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ			স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম		
	২০০০	২০০১	২০০২	২০০০	২০০১	২০০২
বরিশাল	৩.৭	৪.৯	৪.৬	৫.০	৫.১	৫.৫
চট্টগ্রাম	২.০	১.৩	৩.১	৫.৩	৫.১	৫.০
ঢাকা	১.৭	২.০	২.১	৫.৩	৫.৪	৫.৬
খুলনা	৪.৬	৪.৩	৪.০	৫.২	৪.৮	৫.৪
রাজশাহী	৫.২	৫.৯	৩.৯	৫.৫	৫.৩	৫.৬
সিলেট	২.৭	২.৫	৩.৯	৫.৫	৫.৪	৫.৩
সকল বিভাগ	৩.২	৩.৪	৩.৪	৫.৩	৫.২	৫.৪

* প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যায়

জিআর এবং আইসিডিডিআর,বি উভয় সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত স্থূল জন্মহার প্রায় সমান। তবে জিআর-এর মাধ্যমে উভয় উপজেলা থেকে প্রাপ্ত নবজাতক মৃত্যুহার, নবজাতকোর্ধ শিশু মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার এবং স্থূল মৃত্যুহার আইসিডিডিআর,বি সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত হারসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম (সারণি ৪)।

প্রতিবেদক: হেলথ্ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি এবং ভূতপূর্ব একীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), ঢাকা

সারণি ৪: অভয়নগর এবং মীরসরাই উপজেলার সার্ভিলেন্স ইউনিয়নসমূহের জনমিতি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক

	অভয়নগর				মীরসরাই			
	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
স্থুল জন্মহার +								
জিআর	২০.৮	২২.০	২২.২	২১.৪	২০.২	১৯.৮	২০.৯	১৯.৮
সার্ভিলেন্স	২৩.৩	২২.৭	২৫.৪	২২.৪	২৪.৫	২৪.২	২৪.৪	২৪.৮
নবজাতক মৃত্যুহার *								
জিআর	৪.৭	১৪.৭	১৪.৪	১১.৯	১২.৪	১৫.২	১২.৮	১০.০
সার্ভিলেন্স	৩৪.১	৩২.২	২৫.০	৪১.৮	৪৪.৯	৩৪.০	২৬.৯	৩৭.৫
নবজাতকোর্ধ শিশু মৃত্যুহার *								
জিআর	১৩.৬	১০.৪	৮.৪	৯.৭	৬.৫	৭.৯	৭.৪	৫.৩
সার্ভিলেন্স	১৪.৯	৬.০	১০.৭	১৩.৯	১৮.৬	১৪.৩	১৬.২	১৯.৮
শিশু মৃত্যুহার *								
জিআর	১৮.৩	২৫.১	২২.৯	২১.৬	১৮.৯	২৩.১	২০.২	১৫.৪
সার্ভিলেন্স	৪৯.০	৩৮.২	৩৫.৬	৫৫.৭	৬৪.৫	৪৮.৩	৪৩.১	৫৭.৪
স্থুল মৃত্যুহার +								
জিআর	৪.২	৪.৪	৩.৯	৩.৭	২.৮	৪.২	২.৯	৩.৪
সার্ভিলেন্স	৫.৯	৪.৭	৬.১	৬.৪	৭.৬	৬.৭	৬.৯	৮.২

+ প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যায় * প্রতি ১,০০০ জীবিত প্রসবে

মন্তব্য

জিআর-এর মাধ্যমে বাৎসরিক উপাত্ত সংগ্রহের একটি বিশাল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠকর্মীদের সেবাদানের কাজে (সেবাগ্রহণকারীদের বাড়িতে অথবা স্থায়ী সেবাদান কেন্দ্রে) চার থেকে ছয় মাস যাবত বিঘ্ন ঘটে। এ-বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, জন্ম ও মৃত্যু-সংক্রান্ত যেসব তথ্য জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয় তা পদ্ধতিগতভাবে কঠোর নিয়মানুবর্তীতার মধ্য দিয়ে সংগৃহীত অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনীয় নয়। যেসব সম্ভাব্য কারণে জিআর তথ্য অন্যান্য পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনীয় নয় তা হলো: সংগৃহীত তথ্যের অপ্রতুল যাচাই-বাছাই; এলাকা এবং এলাকার অধিবাসীদের সম্পর্কে মাঠকর্মীদের পূর্ব অনুমিত ধারণা; তদারকি কার্যক্রমের অপ্রতুলতা এবং যেকোনো পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের অপর্যাপ্ত পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণীবিন্যাসে সম্ভাব্য আর যেসব সমস্যা হয়ে থাকতে পারে সেগুলো হলো– নবজাতকের মৃত্যুকে মৃতজন্ম (স্টিলবার্থ) হিসেবে বিবেচনা করা, জন্মের পরপরই মৃত্যু হয়েছে এমন নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনাসমূহ খুব কমই জানতে পারা, নবজাতকের মৃত্যুকে নবজাতকোর্ধ-বয়সী শিশু মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করা এবং নবজাতক ও নবজাতকোর্ধ-বয়সী শিশু মৃত্যুহার-সংক্রান্ত তথ্য যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তারা উক্ত শিশুদের মা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। জন্ম-মৃত্যু-সংক্রান্ত ভুল তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অন্যান্য তথ্যও নির্ভরযোগ্য নয়।

মাঠকর্মীরা জানিয়েছেন যে, জিআর-এর মাধ্যমে সংগৃহীত যেসব উপাত্ত তাঁরা সচরাচর ব্যবহার করেন সেগুলো হলো– মাসিক অগ্রিম কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য মোট বাড়ির সংখ্যা, টিকাদান কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এক বছরের কম-বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সরবরাহের জন্য মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা নির্ধারণ; পদ্ধতিভিত্তিক সক্ষম দম্পতিদের শ্রেণীবিন্যাস এবং কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। জিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এ-ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিশ্রুত উল্লেখযোগ্য সম্পদের বরাদ্দ যেখানে রয়েছে, সেখানে কার্যক্রমটি আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে, অপেক্ষাকৃত কম বাড়ি নিয়ে গঠিত একটি একক থেকে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে আরো তাড়াতাড়ি প্রতিনিধিত্বশীল উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেসব ফলাফল অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে পাওয়া যায় না সেগুলো নির্ধারণের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হলে আরো সময় ও অর্থের সাশ্রয় হতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর স্বামীদের সাময়িকভাবে বাড়ি থেকে দুরে অবস্থান করার প্রভাব

একটি নির্ধারিত এলাকা থেকে যাঁরা অস্থায়ীভাবে বিদেশে অথবা বাংলাদেশের কোনো স্থানে কাজ করতে যান, তাঁদের পরিবারসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর তাঁদের অনুপস্থিতির প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত মীরসরাইয়ে আইসিডিডিআর,বি-র সার্ভিলেন্স এলাকার ১৫-৪৯ বছর-বয়সী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিবাহিত মহিলা জানিয়েছেন যে, তাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করছেন। ২০০১-২০০৩ সালের সার্ভিলেন্স উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ এমনকি স্থায়ী পদ্ধতির ব্যবহারও এসব মহিলার মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। কিছু মহিলার স্বামী দীর্ঘদিন পরিবারে অনুপস্থিত থাকার ফলে সমগ্র এলাকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ফলে যেসব এলাকায় বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারীদের হার অনেক বেশি, সেসব এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের সময় এ-বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত। যেসব মহিলার স্বামী বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করেন তাঁদেরকে পরামর্শ প্রদান করলে তাঁদের স্বামী বাড়িতে আসার পর তাঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তুতি বেড়ে যেতে পারে। স্বামী-স্ত্রী-র এই সাময়িক বিচ্ছেদ প্রজনন হারের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে কি না তা জানার জন্য আরো গবেষণা চলছে।

১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ২০০,০০০ বাংলাদেশী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে পাড়ি জমায় (১)। কাজের জন্য বাড়ির বাইরে অবস্থান, তা বিদেশে হোক বা দেশের মধ্যে হোক, অনেক পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাইয়ে আইসিডিডিআর,বি-এর একটি সার্ভিলেন্স এলাকায় ১৫-৪৯ বছর-বয়সী প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মহিলা জানিয়েছেন যে, তাঁদের স্বামী কাজের জন্য বাড়ি থেকে দুরে অবস্থান করছেন – এঁদের ৮% বাংলাদেশে এবং ১৭% বিদেশে অবস্থান করছেন (২)। বাড়ির বাইরে অবস্থানরত জনগোষ্ঠির ওপর প্রজনন-সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব গবেষণা করা হয় সেগুলো মূলত সেসব দম্পতির ওপর গুরুত্বারোপ করে যাঁরা একসংগে বাইরে থাকেন। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীর বাড়ির বাইরে অবস্থান মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে কি না তা মূল্যায়ন করা।

মীরসরাই সার্ভিলেন্স এলাকার ১৫-৪৯ বছর-বয়সী বিবাহিত (গবেষণা চলাকালীন) সব মহিলাকেই

এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আইসিডিডিআর,বি-র হেলথ্ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন (এইচএসআইডি) ১৯৯৯ সাল থেকে মীরসরাই উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে (১৯৯৪ সাল থেকে ৫টি ইউনিয়নে) হেলথ্ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতি ৪টি পরিবার থেকে ১টি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং এভাবে প্রায় ৬,৯০০ জন বিবাহিত মহিলাকে সার্ভিলেন্সের আওতাভুক্ত করা হয়। বিবাহিত মহিলাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেগুলো হলো– পরিবারের সদস্যদের সামাজিক-জনমিতিক (সোসিও-ডেমোগ্রাফিক) তথ্য, বৈবাহিক অবস্থার পরিবর্তন, বাড়ির বাইরে কারো অবস্থান এবং/অথবা কারো আগমন (অবস্থানের তারিখ, কারণ, গন্তব্যস্থল, ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত), প্রজনন স্বাস্থ্য (রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্), গর্ভধারণ ও তার ফলাফল, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও তা সরবরাহের উৎস-সংক্রান্ত। আলোচ্য গবেষণায় স্বামীর অবস্থানের ভিত্তিতে ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পুরো সময় ধরে তালিকাভুক্ত মহিলাদের তিনটি ভাগে ভাগ করে তাঁদের বয়স এবং জীবিত-সন্তান-সংখ্যা অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের হারের তুলনা করা হয়েছে। যে তিনটি ভাগে মহিলাদের ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হলো– স্বামীর বাড়িতে অবস্থান, বাড়ির বাইরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থান (৬০ দিনের বেশি) এবং বিদেশে অবস্থান (৬০ দিনের বেশি)।

বিবাহিত মহিলাদের সামাজিক-জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

মীরসরাই-এর সার্ভিলেন্স এলাকায় ২০০১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেখা যায় যে, ১৫-৪৯ বছর-বয়সী বিবাহিত মহিলাদের ৬,২৭৭ জনের মধ্যে ৩৩৩ জনের (৫%) স্বামী ৬০ দিনের কম সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন (৬০ দিনের কম সময়কে বাড়ির বাইরে অবস্থানকারী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয় নি)। অন্য ৫,৯৪৪ জন মহিলা ছিলেন নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর: ক) যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তাঁরা ছিলেন ৪,৪৫৯ জন (৭১%); খ) যাঁদের স্বামী ৬০ দিনের বেশি বিদেশে অবস্থান করছিলেন তাঁরা ছিলেন ১,০৬৮ জন (১৭%) এবং গ) যাঁদের স্বামী ৬০ দিনের বেশি বাড়ির বাইরে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন তাঁরা ছিলেন ৪১৭ জন (৭%)।

তিনটি শ্রেণীর মহিলাদের বয়সের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিলো। এঁদের মধ্যে ২০-২৯ বছর-বয়সী মহিলাদের স্বামীই অধিক হারে বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন। এঁদের মধ্যে ৪১%-এর স্বামী বিদেশে এবং ৪১%-এর স্বামী বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করেছেন যার তুলনায় ৩৫%-এর স্বামীকে বাড়িতে অবস্থান করতে দেখা গেছে। বাড়ির বাইরে অবস্থান করছে এমন পুরুষের হার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ২০-৩৪ বছর-বয়সীদের মধ্যে (চিত্র ১)।

মীরসরাইয়ে বাড়ির বাইরে অবস্থানকারীদের ধরন

১৯৯৯-২০০২ সাল পর্যন্ত বাড়ির বাইরে অবস্থানকারী মীরসরাই সার্ভিলেন্স এলাকার পুরুষদের ৫০% প্রধানত কাজের সন্ধানে বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন। মহিলাদের মধ্যে কাজের সন্ধানে বাড়ির বাইরে অবস্থানকারীদের সংখ্যা ছিলো অনেক কম (১০%)। তাঁদের বাড়ির বাইরে অবস্থান করার প্রধান কারণ ছিলো বিয়ে (৪০%)। মহিলাদের মধ্যে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে অবস্থানকারীদের হার সবচেয়ে বেশি ছিলো ১৫-২৪ বছর-বয়সীদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে এ-হার সবচেয়ে বেশি ছিলো ১৫-৩৪ বছর-বয়সীদের মধ্যে (চিত্র ১)। বাড়ির বাইরে অবস্থানকারী পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো ২০-২৪ বছর-বয়সী এবং তাঁদের থেকে সামান্য বেশি-বয়সী

পুরুষ (২৫-২৯ বছর) সবচেয়ে বেশি বিদেশে অবস্থান করেছেন। কাজের জন্য যে ১,৩১১ জন পুরুষ বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের অন্য কোনো উপজেলায় (৪৯%) অথবা বিদেশে (৪৭%) ছিলেন। কাজের জন্য যে ২৩২ জন মহিলা বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের অন্য কোনো উপজেলায় (৮২%) এবং খুব কমসংখ্যক (০.৪%) বিদেশে ছিলেন।

চিত্র ১: ১৯৯৯-২০০২ সাল পর্যন্ত মীরসরাই থেকে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে অবস্থানকারীদের লিঙ্গ এবং বয়সভিত্তিক হার

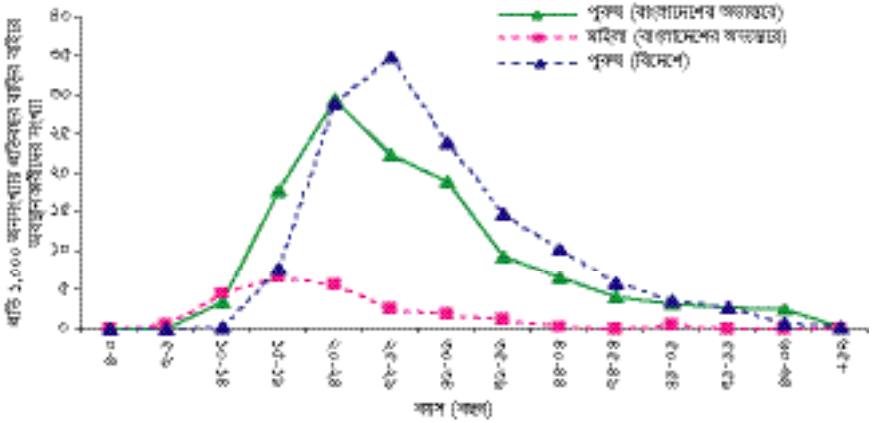

জীবিত সন্তান-সংখ্যা, গর্ভধারণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার

যেসব মহিলার স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন (রেফারেন্ট গ্রুপ) তাঁদের তুলনায় যেসব মহিলার স্বামী কাজের জন্য বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁরা বেশিরভাগই সম্ভবত তাঁদের সংসার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়ির বাইরে গেছেন। যেসব মহিলার স্বামী দুইবারের বেশি বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের সন্তান না থাকার সম্ভাব্যতা বেশি ছিলো এবং যাঁরা স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করছেন না তাঁদের তুলনায় (পি <০.০৫) যেসব মহিলার স্বামী বাইরে অবস্থান করছেন তাঁদের ৫০%-এর মাত্র একটি করে সন্তান থাকার সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে, যাঁরা তাঁদের স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করছেন না তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মহিলার তিনটি বা ততোধিক সন্তান ছিলো – ৫৬% বনাম ৩৮% (পি <০.০৫)। যেসব মহিলা তাঁদের স্বামীর সাথে বসবাস করেছেন তাঁদের (৯%) তুলনায় যাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে গর্ভধারণের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিলো (৫%)। যাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাস করেছেন তাঁদের মধ্যে গর্ভধারণের হার ছিলো সবচেয়ে বেশি (১২%)।

২০০১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক সমীক্ষার সময় যেসব মহিলার স্বামী বাড়ির বাইরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে (৪৬%) এবং যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করছিলেন (৬৩%), তাঁদের তুলনায় যাঁদের স্বামী বিদেশে অবস্থান করেছেন তাঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (যেকোনো পদ্ধতি) ছিলো অনেক কম (৭%)। যেসব মহিলার স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রভাব সার্বিকভাবে সব মহিলার জন্মনিয়ন্ত্রণ

পদ্ধতি ব্যবহারের হার (৫৫%)-এর ওপর পড়েছে (সারণি ১)। যেসব মহিলার স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের সনাতন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতাই বেশি দেখা গেছে। যাঁদের স্বামী বিদেশে অবস্থান করেছেন তাঁদের ৭১% এবং যাঁদের স্বামী বাংলাদেশের ভিতরেই কোথাও অবস্থান করেছেন তাঁদের ৩২% সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এর তুলনায় যাঁরা স্বামীর সাথে বসবাস করেছেন তাঁদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারকারী ছিলেন মাত্র ১৯%। তুলনাযোগ্য শ্রেণীর (রেফারেন্ট) যেসব মহিলা তাঁদের স্বামীর সাথে বাড়িতে বসবাস করেছেন তাঁদের তুলনায় যাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে আধুনিক এমনকি স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যাও ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম। যেসব মহিলার স্বামী বর্তমানে বাড়ির বাইরে বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম দেখা গেছে কনডম ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তাঁদের মধ্যে কনডম ব্যবহারের হার ছিলো অন্যদের তুলনায় সামান্য বেশি।

সারণি ১: ২০০১ সালে মীরসরাইয়ে স্বামীর বাড়ির বাইরে অবস্থানের-ভিত্তিতে ১৫-৪৯ বছর-বয়সী সকল বিবাহিত মহিলার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার

বিবাহিত মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি[১]	বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বিবাহিত মহিলাদের শতকরা হার			
	সকল মহিলা[২] (সংখ্যা=৬,২৭৭)	স্বামী বাড়িতে বসবাস করেন (সংখ্যা=৪,৪৫৯)	স্বামী বাড়ির বাইরে বাংলাদেশে (সংখ্যা=৪১৭)	স্বামী বিদেশে (সংখ্যা=১,০৬৮)
যেকোনো পদ্ধতি ব্যবহার	৫৪.৫	৬৩.২	৪৫.৬*	৭.২*
সনাতন পদ্ধতি	১৫.৫	১১.৭	১৪.৬**	৫.১*
কনডম	২.৭	৩.৪	৪.৮**	০.০*
খাবার বড়ি	১৬.৮	২২.০	১৬.৩*	০.৪*
ইনজেক্শন	১০.৪	১৪.১	৫.৫*	০.১*
আইইউডি	১.৮	২.৪	০.৭*	০.১*
মহিলা বন্ধ্যাকরণ	৫.৭	৭.৫	২.৯*	১.৪*
নরপ্ল্যান্ট	১.৫	২.১	০.৫*	০.১*
গর্ভবতী	৭.৬	৮.৫	১১.৮**	৫.১*
অন্যান্য (যাঁরা কোনো কিছুই ব্যবহার করেন না)	৩৮.১	২৮.৩	৪২.৬**	৮৭.৭**

[১] ২০০১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৫,৯৪৪ জন মহিলার ব্যবহৃত পদ্ধতির-ভিত্তিতে সংখ্যাসমূহ নেওয়া হয়েছে। এসব মহিলা বছরের পুরো সময় ধরেই বাড়ির বাইরে অবস্থানকারীদের একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন

[২] ৩৩৩ জন মহিলা যাঁদের স্বামী ৬০ দিনের কম সময় বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকেও মোট সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

* যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের তুলনায় হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম

** যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের তুলনায় হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি

২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনটি শ্রেণীর এবং ওই তিনটি শ্রেণীর মহিলাসহ সব মহিলার জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের ত্রৈমাসিক গড় দেখানো হয়েছে সারণি ২-এ। যেসব মহিলা তাঁদের স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করেছেন তাঁদের জীবিত-সন্তান-সংখ্যাভিত্তিক (০,১,২,৩+) প্রতিটি শ্রেণীতেই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তবে স্বামী বাড়ির বাইরে থাকুক বা না থাকুক জীবিত-সন্তান-সংখ্যা অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ব্যবহারের হার বেড়ে গেছে। যেসব মহিলার স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের সব বয়স-শ্রেণীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিলো ৫১-৬২% (সারণি ২)। অপরপক্ষে, যাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করেছেন তাঁদের বিভিন্ন বয়স-শ্রেণীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হারে যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ থেকে ৪৪ বছর-বয়সী মহিলাদের (২২-৪৪%) তুলনায় ১৫-১৯ বছর (৫২%) এবং ৪৫-৪৯ বছর-বয়সী মহিলাদের মধ্যে (৬৪%) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিলো বেশি। আবার ৬,২৭৭ জন মহিলার সবার মধ্যে যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের তুলনায় (৫৮%) যে শ্রেণীর মহিলাদের স্বামী অধিক হারে বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিলো বেশ কম (৪১%)।

সারণি ২: স্বামীর অবস্থান, মহিলার বয়স এবং জীবিত-সন্তান-সংখ্যা অনুযায়ী মহিলাদের আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার এবং বৈবাহিক প্রজননের হার: মীরসরাই, ২০০১-২০০৩

জীবিত-সন্তান-সংখ্যা এবং বয়সভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস (বছর)	সকল মহিলা		২০০১-২০০৩ সালের পুরো সময়ব্যাপী স্বামীর অবস্থান					
			বাড়িতে অবস্থানকারী		বাড়ির বাইরে বাংলাদেশে অবস্থানকারী		বিদেশে অবস্থানকারী	
	মহিলার সংখ্যা	সিপিআর	মহিলার সংখ্যা[১]	সিপিআর[২]	মহিলার সংখ্যা[১]	সিপিআর[২]	মহিলার সংখ্যা	সিপিআর
জীবিত-সন্তান-সংখ্যা								
০	৫৬৪	১৩.৫	১৫৭	২২.৩	১২	০.৩*	১৩	০.০*
১	১,১২৯	২৬.৮	৩৮৬	৩৮.৬	২১	২০.২*	২৯	২.৩*
২	১,৩৯৪	৪৩.৪	৬৮৩	৫৪.৮	২৭	৪০.১*	৫৪	২.০*
৩+	৩,১৯০	৪৮.৯	১,৮৬০	৬৩.৭	৪২	৪৫.০*	৯৮	৬.১*
বয়সের শ্রেণীবিন্যাস								
১৫-১৯	৮৬৫	৪০.৪	৪৪২	৫৫.৪	১১	৫১.৫	১৬	০.০*
২০-২৪	১,২১৭	৩৯.৩	৫৬৩	৫৭.৮	২৪	৪৩.৮*	৪৪	৫.৯*
২৫-২৯	১,০৯৩	৪১.৩	৫১০	৬২.১	১৬	২১.৯*	৩৯	০.২*
৩০-৩৪	১,১৭৬	৪১.৬	৫৯৫	৫৯.২	১৯	৩৬.০*	৪৮	৮.৭*
৩৫-৩৯	১,০০১	৪০.৩	৫০৮	৫৭.১	১৭	২৮.৪*	২০	০.০*
৪০-৪৪	৬৮২	৪১.৯	৩৫১	৫৭.৬	৯	২২.২*	১৭	৬.৪*
৪৫-৪৯	২৪৩	৩৫.০	১১৭	৫১.১	৬	৬৩.৯	১০	০.০*
১৫-৪৯	৬,২৭৭	৪০.৫	৩,০৮৬	৫৮.০	১০২	৩৬.৬*	১৯৪	৪.১*

[১] ২০০১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে মোট বিবাহিত মহিলা

[২] ২০০১-২০০৩ পর্যন্ত স্বামীর অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত প্রতিটি দলভুক্ত মহিলাদের মধ্যে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারের ত্রৈমাসিক গড়

* যাঁদের স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের তুলনায় হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম

যেসব মহিলার স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন তাঁদের প্রজনন হার মূল্যায়নের জন্য আরো উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ এগিয়ে চলছে। বাড়ি পরিদর্শণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য প্রজনন হার মূল্যায়নের এ-কাজটি করা কঠিন। যেসব মহিলার স্বামী বিদেশে অবস্থান করছেন

তাঁদের তুলনায় যাঁদের স্বামী বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করছেন তাঁদের বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে এ-জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হতে পারে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০১-২০০৩ সালের মধ্যে যেসব মহিলার স্বামী বাড়িতে অবস্থান করেছেন তাঁদের তুলনায় (প্রতি ১০০০-এ ১০৪ জন) যাঁদের স্বামী বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করেছেন তাঁদের বাৎসরিক প্রজনন হার (২০০১ সালের শুরুতে ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রতি ১০০০ জনে) খুব একটা কম নয় (প্রতি ১০০০ জনে ৯৫ জন)। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, যেসব মহিলার স্বামী বিদেশে থাকেন তাঁদের প্রজনন হার খুব কম (প্রতি ১০০০ জনে ৩৪ জন)। বয়সের একটি বিশেষ মান ঠিক করে (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) দেখা গেছে যে, যাঁদের স্বামী বিদেশে থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রজনন হার ৬৮% কম এবং যাঁদের স্বামী বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করেন তাঁদের মধ্যে ১৪% কম। দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে অবস্থানের পর যাঁদের স্বামী বাড়িতে ফিরে আসেন সেসব দম্পতির মধ্যে বর্ধিত মাত্রায় প্রজননের সম্ভাবনাটিকেও বিবেচনায় আনা দরকার। হতে পারে স্বামী বাড়িতে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের বয়সভিত্তিক (এজ কোহর্ট) প্রজনন হার খুব বেশি কমে না। যাই হোক, মীরসরাইয়ে বসবাসকারী সক্ষম দম্পতিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন তাঁদের প্রজননক্ষম সময় কমে যায়।

প্রতিবেদক: হেলথ্ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

মন্তব্য

মীরসরাই সার্ভিলেন্স এলাকা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বা চট্টগ্রাম বিভাগ অথবা চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধিত্বকারী নয়। এতদসত্ত্বেও, ২০০৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে সার্ভিলেন্স এলাকার ১৫-৪৯ বছর-বয়সী সব বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (আধুনিক) ব্যবহারের হার (৩৭%) ২০০৪ সালের জনমিতিক এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষায় প্রতিফলিত সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের হারের অনুরূপ ছিলো (৩)। চট্টগ্রাম বিভাগের বিবাহিত মহিলাদের কত অংশের স্বামী বাড়ি থেকে বাইরে অবস্থান করেছেন তা জানা যায় নি, তবে মনে হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর এর একটি প্রভাব পড়েছে। মীরসরাইয়ের এক-তৃতীয়াংশ স্বামীর বাড়িতে অনুপস্থিতি সমগ্র সার্ভিলেন্স এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে। যেসব মহিলা স্বামীর সাথে এখন বসবাস করছেন শুধুমাত্র তাঁদের কথা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫৫% এবং গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ৬০%। এর ওপর ভিত্তি করে উক্ত এলাকায় পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার যতটা বেড়েছে তা এ-পদ্ধতি ব্যবহারে সবচেয়ে অগ্রগামী রাজশাহী বিভাগের সাথে তুলনীয় (৫৮%)। যেসব এলাকায় বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারীদের হার অনেক বেশি, সেসব এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের সময় এ-বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত। যেসব মহিলার স্বামী বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন তাঁদেরকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা উচিত এবং তাঁদের স্বামী বাড়ি ফেরার পর তাঁরা যাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন সেজন্য তাঁদেরকে পরামর্শ প্রদান করা উচিত। যাঁদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা আশানুরূপ হয়ে গেছে, এমন দম্পতিদেরকে স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০০৪ - আগস্ট ২০০৫

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=২৫৫)	*ভি. কলেরি* O১ (সংখ্যা=৯৯২)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪১.২	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	১০০.০	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৬.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৮.৮	১.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৯.৬	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৫০.৪
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৫৮.৩
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.৪

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ***O১***, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০০৪-আগস্ট ২০০৫**

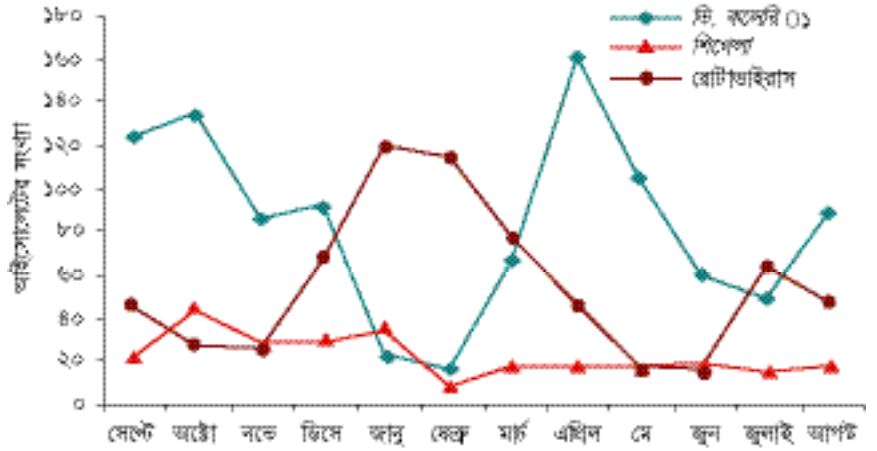

*উল্লিখিত সময়কালে কোনো *ভি. কলেরি* ***O১***৩৯ জীবাণু পাওয়া যায় নি

৪৩টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন:* নভেম্বর ২০০৩-মে ২০০৫

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারি (সংখ্যা=৪০)	একোয়ার্ড * (সংখ্যা=৩)	মোট (সংখ্যা=৪৩)
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৬ (৪০.০)	১ (৩৩.৩)	১৭ (৩৯.৫)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৪ (১০.০)	১ (৩৩.৩)	৫ (১১.৬)
ইথামবিউটল	৩ (৭.৫)	১ (৩৩.৩)	৪ (৯.৩)
রিফামপিসিন	২ (৫.০)	০ (০.০)	২ (৪.৭)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	১ (২.৫)	০ (০.০)	১ (২.৩)
অন্যান্য ওষুধ	১৯ (৪৭.৫)	১ (৩৩.৩)	২০ (৪৬.৫)

( ) শতকরা হার *১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৫ (সংখ্যা=২১)*

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১৪.৩	০.০	৮৫.৭
পেনিসিলিন	৯.৫	১৪.৩	৭৬.২
স্পেক্টিনোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	১৪.৩	৪.৮	৮১.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল ২০০৪-আগস্ট ২০০৫*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এম্পিসিলিন	৫৯	৯৭	৩	০
কোট্রাইমোক্সাজোল	৬০	২৩	৩	৭৩
ক্লোরামফেনিকল	৫৯	৮৮	০	১২
সেফট্রিয়াক্সোন	৫৯	৯৫	৫	০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৬০	৯০	৭	৩
জেন্টামাইসিন	৫৪	৪৪	২	৫৪
অক্সাসিলিন	৫৭	৯৬	৪	০

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে এইচএসবি-এর এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলংকা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

ছবি : একজন প্যারামেডিক এক মহিলার আঙ্গুলের মাথা থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছেন (সৌজন্যে - ডা: কে. জামান)

সম্পাদকমণ্ডলি	স্টিফেন পি. লুবি পিটার থর্প এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদনা বোর্ড	চার্লস পি লারসন এমিলি গারলী
অতিথি সম্পাদক	পিটার কিম স্ট্রিটফিল্ড আনোয়ার হোসেন
যাঁরা লেখা দিয়েছেন	কে. জামান আলী আশরাফ অ্যালেক মার্সার
কপি সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ	এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং	মাহ্‌বুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

এ-সংখ্যাটির পিডিএফ এবং পূর্ববর্তী সকল সংখ্যার পিডিএফ-এর জন্য আমাদের ওয়েব সাইট ভ্রমণ করুন:
www.icddrb.org/hsb